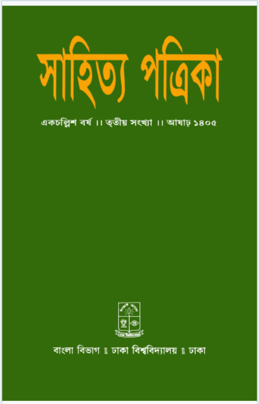

Vol. 41 | No. 3 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম

Volume	41
Issue	3
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মেহের নিগার
Published online	June 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i3.1
Pages	5-35
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম

Check for updates

মেহের নিগার*

বিশ্বমনস্ক, আধুনিক ও নিরীক্ষাশীল নাট্যকার সাঈদ আহমদ (জন্ম : ১৯৩১) বাংলা নাটকের জগতে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী কণ্ঠ। বস্তুত তাঁর লেখনী সূত্র ধরেই বাংলা অ্যাবসার্ড নাটকের গোড়াপত্তন বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশে।[১] তাঁর সমসাময়িক বাংলাদেশের অপর দুই প্রধান নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) এবং মুনীর চৌধুরী (১৯২৪-১৯৭১) রচিত কতিপয় নাটকে অ্যাবসার্ড রীতির সীমিত পরিমাণ চারিত্রলক্ষণ পরিদৃষ্ট হলেও মূলত সাঈদ আহমদের নাটকগুলোর বিষয়বস্তু এবং ফর্ম স্পষ্টতই অ্যাবসার্ডধর্মী।[২] চিরাচরিত প্রথাসিদ্ধতা থেকে দূরত্ব রাখা এবং জীবন ও শৈল্পিক দাবির প্রতি নিবিড় মনোযোগ তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'কালবেলা' (১৯৬৩), 'মাইলপোস্ট' (১৯৭৬) এবং 'তৃষ্ণায়' (১৯৭৬) - এই তিনটি নাটক তাঁকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করেছে একজন সফল ও কৃতী নাট্যকার হিসেবে। শুধু সাহিত্যমূল্যেই নয়, রীতির দিক থেকেও বাংলা মঞ্চনাটকে নতুন Trend বা ধারা প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।[৩] ধারাবাহিকভাবে কৌতূহলোদ্দীপক এবং পরীক্ষামূলক অভিনব কাজের মাধ্যমে তিনি তদানীন্তন পূর্ববাংলার নাট্যাঙ্গনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় শৈল্পিক ভাবচেতনা, আধুনিক জটিল মানসজগতের অন্তর্দৃষ্টি ও পাশ্চাত্য নাট্যকৌশল প্রবর্তনে সক্ষম হন।[৪] এ বিষয়ে বিশিষ্ট নাট্যকর্মী বজলুল করিমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ.৭৩

২. কবীর চৌধুরী, *অ্যাবসার্ড নাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯ (২য় সং), পৃ. ৮৬

৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)', *থিয়েটার ও নাট্য ত্রৈমাসিক*, ঢাকা, বিংশতিতম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ২৯০

৪. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ১, পৃ. ৭১

পঞ্চাশ দশকের ইউরোপে অস্তিত্ববাদী (Existentialism) এবং অধিবাস্তববাদী (Absurd) ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটছিল, তার সঙ্গে এতদঞ্চলের, একরকম বলতে গেলে, প্রথম পরিচয় ঘটে, ১৯৬২ সনে মঞ্চস্থ সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাটকের মাধ্যমে। সেই দিক থেকে প্রাচ্যের এই অঞ্চলে নাটকটি ভাবনার গহনরাজ্যে আরেকটি দিকের দিশারি বলা যায়।[৫]

ইউরোপীয় অ্যাবসার্ড নাটকের বিমূর্ত বাস্তবতা ও ভাবজগতের স্তরসংকুল জটিলতা তাঁর অবলম্বিত রীতি হলেও একদেশদর্শী অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ তাঁর চারিত্র্য নয় বরং তাঁর সমসাময়িকেরা যখন সমকালীন সমাজবাস্তবতা কিংবা ইতিহাস ও পূরাণের গতানুগতিক ঘটনাকে নাট্য উপাদান করে তুলছেন, সেই মুহূর্তে তিনি, লোকায়ত জীবন বিষয় ও ঐতিহ্যের সঙ্গে চিরন্তন বিশ্বজনীন মানবিক অনুভূতি, অস্তিত্বের স্তরময় জটিলতা ও গভীরতর আত্মিক সংকটের সত্যতা নিয়ে লেখালেখি করছেন।[৬] তাই তাঁর নাটকের উপজীব্য বিষয় স্থান-কাল-পাত্র-প্রেক্ষিতেই সীমারেখায় গণ্ডীবদ্ধ না হয়ে বরং অ্যাবসার্ড রীতি অনুসারে এক শিল্পমুখ্য কালোত্তীর্ণ ব্যঞ্জনাধর্মিতার দিকে এগিয়েছে।[৭]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এই পথিকৃৎ নাট্যকারের চারটি নাটকের অ্যাবসার্ড ধর্ম সন্ধানে সচেষ্ট হব। এগুলো হচ্ছে,

১। কালবেলা (রচনা ১৯৭১, মঞ্চায়ন ১৯৬২, পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৭৩, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৯৭)

২। মাইলপোস্ট (রচনা ১৯৬২-১৯৬৪, প্রকাশ ১৯৭৬)

৩। তৃষ্ণায় (রচনা ১৯৬৪-১৯৬৬, প্রকাশ ১৯৭৬)

৪। প্রতিদিন একদিন (রচনা ১৯৭৫, প্রকাশ ১৯৭৮)

---

৫. বজলুল করিম, দ্রষ্টব্য - 'কালবেলা' নাটকের শিরোনামহীন ভূমিকা, সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, কালবেলা/মাইলপোষ্ট/তৃষ্ণায়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

৬. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ১, পৃ. ৭৪

৭. হাসান হাফিজুর রহমান, 'সাঈদ আহমদের নাটক', ১৯৭৫, ঢাকা, দ্রষ্টব্য - 'প্রতিদিন একদিন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫, পৃ. ৪৬

বিংশ শতাব্দীর, যুদ্ধোত্তর বৈনাশিকতার অভিঘাতে সৃষ্ট অস্তিত্বের সংকট, শূন্যতা, জীবনের অর্থহীনতা, আত্মবিযুক্তি, ক্লান্তি, নৈসঃঙ্গ্য ও নিরর্থকতা নিঙড়ে অ্যাবসার্ডধর্মী যে সাহিত্যধারার জন্ম হয়েছিল, সাঈদ আহমদ রচিত নাটকের চরিত্র, সংলাপ, বিষয় ও রীতির উপস্থাপনভঙ্গিতে তার লক্ষণ সন্ধানই আমাদের লক্ষ্য।

নাট্যকার সাঈদ আহমদের রচনায় অনুপ্রবেশের আগে প্রথমেই প্রশ্ন আসে অ্যাবসার্ড নাট্যকলার অভীষ্ট কি? বস্তুত অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের সেই প্রতিবিম্বকে তুলে ধরা যা বাস্তবতার আপাতত রূপের অন্তর্ভেদ করে তার অস্থি ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে চায়। 'মহাযুদ্ধের সন্তান' অ্যাবসার্ড নাট্যকলার জনকেরা – স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬–১৯৮৯), আর্থার অ্যাডামোভ (জন্ম. ১৯০৮), জঁা জেন্যে (জন্ম. ১৯১০), ইউজোঁ ইয়োনেস্কো (জন্ম. ১৯১২) কিংবা এডওয়ার্ড অ্যালবি (জন্ম, ১৯২৮), বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের এক বিমূঢ় প্রতিবেশের মাঝে আজন্মলালিত বোধ ও বিবেকের ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে চারপাশের চিরপরিচিত জগতের এক প্রচণ্ড বাঁক বদলকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই নাট্যকারেরা পরম সাহসিকতায় সেই বিপর্যস্ত জীবনের বিপন্নতা ও অচিন্তনীয় অবক্ষয়কে স্বীকার করে নেন। সেই অদ্ভুত আঁধারময় প্রহরে তাঁরা মানুষের মনোজগতের অভাবিত বহুমাত্রিকতা, উন্মূলিত পরাভূত অস্তিত্বের সংকট ও বৈপরীত্য, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একাকী জীবনের দুর্বোধ্যতা, ঈশ্বরের অনুপস্থিতি, অনিশ্চিতির করাল গ্রাস, আচরণ ও মূল্যবোধের অসারতা, সম্পর্ক ও বিশ্বাস বিনষ্টির শীতল স্বাভাবিকতাকে শিল্পিত নিষ্ঠায় তাঁদের অ্যাবসার্ড ক্যানভাসে অকপটে তুলে ধরেছিলেন। তাঁদের রচিত সেই সব নাটকের চরিত্ররা আর পরিচিত বাস্তবধর্মী মানবিক আদল হয়ে ধরা দেয়নি। বরং কখনো প্রতীকী কখনো সংকেতময় ভূমিকায় হয়ে গেছে এক একটি অন্তর্বোধ ও বিকারের প্রক্ষেপণ, কখনো কতিপয় মূল্যবোধের বিরোধ ও সংঘাত কিংবা সমাজের ভণ্ডামির প্রতি তীব্র বিদ্রূপ, কখনো জীবন ও বাস্তবতার অন্তঃস্থিত কঙ্কালের উলঙ্গ অবয়ব। সেই সময়কার ফ্যাসিস্ত বিশ্বের পরম নাস্তির মাঝে, এক প্রবল অভিশঙ্কা, বহুমুখী চাপ, সর্বব্যাপী অর্থহীনতা ও অস্তিত্বের বিপর্যয় মানুষকে তাদের পরিচিত জগৎ ও বোধ থেকে অনবরত বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত করেছে। আর অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্ভট বিষম প্রেক্ষাপটে, যৌক্তিকতাহীন অসংলগ্ন সংলাপে, পারম্পর্যহীন ঘটনা প্রবাহের ঐক্যহীনতায়, অসঙ্গতিময় বিষয় ও রীতির উপস্থাপনে ফুটে উঠেছে মনোজগতের স্তর–স্তরান্তরে সুড়ঙ্গপথে ছুটন্ত মরিয়া সেইসব মানবাত্মা বাঁকাচোরা বিধ্বস্ত

জীবনবাস্তবতার প্রতিসরিত কিম্ভূত স্বরূপ।

অ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ-ব্যাখ্যাতা Martin Esslin-এর বক্তব্য- The Theatre of the Absurd speaks to a deeper level of the audience's mind. It activates psychological forces, releases and liberates hidden fears and repressed aggressions, and, above all, by confronting the audience with a picture of disintegration, it sets in motion and active process of integrative forces in the mind of each individual spectator.[৮]

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা আপাত অসঙ্গতির আড়ালে নাটকের পটভূমিতে এই অসমঞ্জস পৃথিবী, বিশ্বাসচ্যুত অর্থহীনতাময় পৃথিবীর অপ্রকৃতস্থতা থেকে জীবনের নতুনতর অর্থ আবিষ্কারের পথ সন্ধান করে চলেছেন এবং তা ঘটছে নাটক ও দর্শকের গভীরতর মানসিক আন্তঃক্রিয়ায়।

বিশিষ্ট নাট্যকর্মী আতাউর রহমান বলেন – "অ্যাবসার্ড থিয়েটার এই অনুসন্ধানেরই একটি মাধ্যম যা সাহসের সঙ্গে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলা অধঃপতিত মানুষদের জন্য। জীবনের নিশ্চিতিকে হারিয়ে ফেলার দুঃখবোধকে অ্যাবসার্ড থিয়েটার চেষ্টা করছে এক অদ্ভুত আপাত বিরোধী সত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে। আজকের বর্ণহীন পৃথিবীর মানুষের তীক্ষ্ণতম জীবন–জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই নাটক।"[৯]

সাঈদ আহমদ রচিত আলোচ্য নাটকের সবগুলোই পুরোপুরি অ্যাবসার্ড নাটক না হলেও অস্তিত্ববাদ ও অধিবাস্তববাদ তার নাটকের মূল অনুসৃত রীতি। বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক–মানসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে ভোগক্লিষ্ট, একঘেঁয়েমি ভাব দ্বারা আক্রান্ত (Age of Boredom), এর সাথে ইউরোপীয় অ্যাবসার্ডধর্মী সাহিত্যধারার আত্মিক প্রভেদ থাকাই স্বাভাবিক। তথাপি সাঈদ আহমদের রচনারীতির সূত্রে বিশ্ব–নাটকের নিরীক্ষাধর্মী এই ব্যতিক্রমী ধারার সঙ্গে বাংলা নাটকের সংশ্লেষণ মনোযোগী বিশ্লেষণের দাবিদার।

---

৮. Martin Esslin, *The theatre of the Absurd* (London : Penguin Book, revised edition, 1968) p. 402

৯. আতাউর রহমান, 'অ্যাবসার্ড থিয়েটার', *থিয়েটার পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, তৃতীয় ত্রৈমাসিক সংকলন, মে ১৯৭৩, পৃ. ৯৬

১. কালবেলা (১৯৬৩)

বিষয় নির্বাচনের স্বাতন্ত্র্যে, শৈল্পিক পরিমিতিবোধ, অন্তর্চেতনার জটিল গভীরতায় এবং উপস্থাপনের বিচিত্র অভিনবত্বে সাঈদ আহমদের প্রথম রচনা ও বাংলা নাটকে প্রথম অ্যাবসার্ডধর্মী সৃষ্টি 'কালবেলা' (১৯৬৩) একটি স্মরণীয় নাটক, যা বাংলা নাটকের ধারায়ও অন্যতম মাইলফলক।[১০] গ্রন্থভুক্ত 'কালবেলা'য় প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কে কোনো দৃশ্য সংযোজিত হয়নি। 'পরিক্রম' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কালবেলা'য় একটি মাত্র অঙ্কে দুটি দৃশ্য বিদ্যমান। এ নাটকে প্রতীক্ষারত মানুষের দল নিকটাগত অবশ্যম্ভাবী ঝড়ের অবধারিত আক্রমণের অপেক্ষা করে চলেছে। পরম ধ্বংস ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাদের আচরণ এক নির্বিকার অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার পরিচয়বাহী। ১৯৬১ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এ নাটকের প্রেক্ষাপট। কিন্তু নাট্যকার এই বিপর্যয়ের কাহিনীকে গতানুগতিক যুক্তিনির্ভর বাস্তববাদী পদ্ধতিতে নির্মাণ করেননি বরং নাটকীয় উৎকণ্ঠা এবং নিবিড়করণ (Compactness)-এর সমন্বয়ে তাকে উপস্থাপন করেছেন অস্তিত্ববাদী ভঙ্গি, অ্যাবসার্ড নাটকের অভিনব আঙ্গিক কৌশল ও সংগঠন শৈলীতে। সমালোচকেরা সনাক্ত করেন —

ক. কবীর চৌধুরী

১. এই নাটকে (কালবেলা) বস্তুতঃপক্ষে কোন কাহিনী বা ঘটনা নেই। বাস্তববাদী নাটকের প্রকরণ বর্জন করে নাট্যকার এখানে পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাটকের আঙ্গিকে ঘটনাবিহীন, অসংলগ্ন সংলাপ-নির্ভর, অস্তিত্ববাদী দর্শনাশ্রয়ী...একটি নতুন ধরনের নাটক বাঙালি দর্শক–পাঠককে উপহার দিলেন ।[১১]

২. বেকেটের 'গডোর প্রতীক্ষায়' নাটকের কথা মনে পড়ে নাকি? গুটি কয়েক মানুষ সুদূর এক চরাঞ্চলে সর্বধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস কখন এসে আঘাত হানবে তার জন্য

---

১০. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা ঃ ১৯৪৭–১৯৭১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩১১

১১. কবীর চৌধুরী, 'আমাদের নাটকে নবতরঙ্গ', *সুন্দরম্* (সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শীত ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ২

অপেক্ষা করছে এই কালবেলায়। অনিবার্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি তারা। অসহায় প্রতীক্ষার অ্যাবসার্ডধর্মী একটি চিত্র পরিবেশিত সাঈদ আহমদের "কালবেলায়।"[১২]

খ. বজলুল করিম

জেমস জয়েস-এর উত্তরসূরী স্যামুয়েল বেকেট-এর কৌশল ও বিন্যাসগত দিক এবং সংলাপ রীতির যেটুকু প্রভাব এই নাটকে (কালবেলা) আছে সেটা অধিবাস্তববাদী নাটকে সাধারণভাবে গৃহীত পদ্ধতি। ... চেতনা আর বোধ যেন ঘটনা এবং আবেষ্টনী ও সময়ের গণ্ডী থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে খেলা করে যায় মঞ্চের সঙ্গীত কতকগুলো মানুষের মাধ্যমে। ..... 'কালবেলা' নাটকটির স্বকীয় এবং বৈশিষ্ট্য সেটার আবেদনে, 'ওয়েটিং ফর গডো" (১৯৫৩) নাটকের মত অন্তের স্পর্শগ্রাসী নাস্তির (Nothing) প্রকৃতি বা রূপের দিকে সম্মোহিত না করে, অপেক্ষার মত নিষ্ক্রিয়তাকে (inaction) ক্রিয়াকর্মে (Action) রূপান্তর ঘটানোতে এবং সর্বোপরি, ইতিহাস পুষ্ট, প্রখরভাবে সচেতন সত্তার গীতিময় প্রকাশে।[১৩]

গ. বিশ্বজিৎ ঘোষ

স্বপ্নব্যাকরণময় কাহিনী বিন্যাস, আপাত: অসংলগ্ন সংলাপ, অর্থহীন প্রতীক্ষা, 'কালবেলা' নাটকের অ্যাবসার্ড ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১৪]

উপরোক্ত সমালোচনাসমূহের আলোকে 'কালবেলা' নাটকের চারিত্রলক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চর আলেকজান্ডারের মৃত্যুর প্রহর গোনা প্রতীক্ষারত মানুষের দল এ নাটকের পাত্রপাত্রী। তাঁর নিজস্ব রচনা রীতি অনুসারে সাঈদ আহমদ এইসব চরিত্রের পরিচয় ও অবস্থান নির্মাণ করেছেন তাঁর কল্পজগতের ভিত্তিভূমিতে। নাটকের চরিত্রাবলি হলো - মোড়ল, আহমদ, মুনীর, ঢুলী, উনেন, উপেং, কুমারী মেয়ে (নিবেদিতা), চারজন পার্ষদ, শিষদার বংশীধারী, দাগী এবং সর্বোপরি স্বয়ং 'আসন্ন-ঘূর্ণিঝড়', যে অদৃশ্য অনুক্ত পরিচয়ে ও অস্তিত্বের বিধ্বংসী প্রাবল্যে নাটকের

---

১২. কবীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২, পৃ. ৮৭

১৩. বজলুল করিম, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৫

১৪. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক ঃ প্রসঙ্গ গঠনশৈলী', *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৯৯১, পৃ. ৭১

সম্পূর্ণ দিগন্ত জুড়ে বিরাজমান। এ নাটকের কাহিনী বা আখ্যানের কোন নির্দিষ্ট আদ্য অন্ত নেই। বরং নিশ্চিত অবলুপ্তির ভয়াবহতার মুখোমুখি দ্বীপবাসী গুটিকয় মানব তথা 'মানুষী প্রতীকগুলোর'[১৫] মনোজগতে অপ্রকাশ্য বিহ্বলতা, উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা ও বিমূঢ় প্রস্তুতির এক অদ্ভুত মুহূর্তিক জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে কালবেলার পরিস্থিতি (situation) পরম্পরায়। Martin Esslin-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য- "The relevant question here is not so much what is going to happen next but what is happening?"'[১৬] কেননা এরপরে যে কোন কিছুই ঘটা সম্ভব। কারণ অ্যাবসার্ড নাটকের প্রবর্তনা ও চরিত্রগুলো একই অপরিবর্তিত আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খায়। সাধারণ প্রবাহের নিয়ম ও সম্ভাবনা দুইই এখানে অচল।[১৭]

মৃত্যুর মুখোমুখি এই দ্বীপবাসীরা তাদের গৌরবময় অতীতের স্মৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চায়। পরিণাম বিনাশী জেনেও আপাত বিচ্ছিন্ন অথচ নিয়তিসূত্রে বাঁধা, মোড়ল–পুরোহিত–দাগী–লোকটা–ঢুলী–মেয়েটা–সবাই স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং পর গডো'–এর (১৯৫৩) গডোর অনিশ্চিত আগমনের জন্য প্রতীক্ষমান ভ্লাডিমির ও এষ্ট্রাগানের মতই অন্তহীন প্রতীক্ষা করে। সমূহ প্রলয়ের জন্য এই অদ্ভুত প্রতীক্ষায়, তাদের চেতনার গভীরতলে আশঙ্কা–ভীতি–গ্লানি–বিস্ময়ের স্রোত বইতে থাকে এবং এই চূর্ণবিভঙ্গ চিত্রকল্প ও আপাত সংগতিহীন সংলাপে নাট্যকার সচেতন শিল্পদৃষ্টিতে অ্যাবসার্ড নাটকের আদল ও কাঠামোকে সুসংহত রূপ দেন। 'কালবেলা' নামকরণের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে এ নাটকের মূল স্বভাবধর্ম। আসন্ন বিপর্যয় জেনেও 'কালবেলা'র মৃত্যুঞ্জয়ী সমুদ্রযোদ্ধাদের উচ্চারণে উঠে আসে মৃত্যুকে অতিক্রম ও উপেক্ষা করার মত অন্তরময় আকুতি ও সক্ষম প্রতীক্ষা।[১৮]

> উপেং সাহস ধরো মোড়ল, সাহস ধরো। আমরা সবাই প্রবাল কীট। আমরা মরে যাবো আর আমাদের জৈব শিলায় গড়ে উঠবে আরেক দ্বীপ। পুতুল আর পুতুল নাচিয়েরা নাচবে, গান গাইবে

---

১৫. সুনীল শর্মাচার্য, 'এ্যাডসার্ড ও আমরা', *থিয়েটার,* নাট্য ত্রৈমাসিক ১০ম বর্ষ, ৩য় -৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা। অক্টোবর, ১৯৯৩, দশম বর্ষপূর্তি বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ২০১

১৬. Martin Esslin, *পূর্বোক্ত,* টীকা নং ৮, প. ৪০৬

১৭. আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত,* টীকা নং ৯, পৃ. ৯৩

১৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত,* টীকা নং ১৪, পৃ. ৭৩, ৭৪

> সেখানে, অনুরাগ বিরাগে মাতবে। খুব অল্প লোকই গর্ব করতে পারে এমন ... (সা.আ.তি.না/কা.বে/পৃ. ১৭)

অ্যাবসার্ড নাটকের মূল বৈশিষ্ট্যের ধারক এর অভূতপূর্ব সংলাপ ও বাক্‌ভঙ্গি। এ প্রসঙ্গে Martin Esslin-এর মন্তব্য আবারও স্মর্তব্য—"It is a theatre of situation as against a theatre of events in sequence, and therefore it uses a language based on patterns of concrete images rather than argument and discursive speech."[১৯] 'কালবেলা' নাটকের নির্মাণ ও কৌশলে স্যামুয়েল বেকেটের কৌশলগত বিন্যাস এবং সংলাপরীতির প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সঙ্গতিহীনতা, দৈর্ঘ্যে স্বল্পাকৃতি এবং চেতনাপ্রবাহের রীতিতে দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ —

ক.	আহম্মদ	বলে যাও হে বোকাচণ্ডী।
	মোড়ল	পুরোহিতের সেই বার্তা।
	মুনীর	উপেং–এর বার্তা মোড়লের জন্য।
	উনেন	উপেং–এর বার্তা এই।
	আহাম্মদ	সংক্ষেপে বলো আমাদের।
	মোড়ল	পুরোহিত যেমনটি বলেছেন।
	মুনীর	শোনার অপেক্ষায় ক্ষয়ে যাচ্ছি আমি।
	আহাম্মদ	দেখার অপেক্ষায় বেঁচে আছি আমি।
	মোড়ল	দেখা ও শোনার প্রতীক্ষায় রয়েছি আমি।
	মুনীর	দেখা এবং শোনার আগে কিছুই বিশ্বাস করা চলে না।
	উনেন	এখন সেই বার্তা শোনাবো আমি। (সা.আ.তি.না/কা.বে./পৃ. ৬ ও ৭
খ.	মুনীর	কেউ আছো? বলি আছো? আশে পাশে কেউ কি আছো?

১৯. Martin Esslin, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৮, প. ৩৯৩

লোকটা	(একটা শিষ দিয়ে) আমি আছি।
মুনীর	কাঠের টুকরোটা খুঁজে দেবে কি আমাদের?
লোকটা	নিশ্চয়ই, একশো বার। সারা জীবন ধরে তো কেবল এইই করলাম। এটা ওটা খুঁজে বেড়ালাম অন্যদের জন্যে।
মুনীর	করলেই বা কেন শুনি?
লোকটা	সহজ কথা। সময়টা কেটে গ্যাছে। [পুরোহিত চেঁচিয়ে ওঠে। কিছু একটা আবিষ্কার করেছে সে।]
পুরোহিত	পেয়ে গেছি ওটা। আমি পেয়ে গেছি ওটা ঐতো ওখানে। [আংগুল দিয়ে দেখায়]
আহাম্মদ	হারাধন খুঁজে পেয়েছে সে।
লোকটা	একেবারে বাজীমাৎ করেছে কেউ।
মুনীর	খুঁজে পেয়েছে সে। [সবাই এ ওর দিকে চায়]
মোড়ল	সর্বনাশ করেছে সে। (বিরতি) আমাদের এখন আরেকটা কিছু খুঁজে বার করতে হবে।
মুনীর	কিসের জন্যে।
মোড়ল	সময় কাটাবার জন্যে।
আহাম্মদ	যাও, তুলে নাও। এবারে আমার পালা।
মোড়ল	যাও, তুলে নাও ওটা।
মুনীর	যাও। [নড়েনা কেউ। কাঠটার ওপর সবাই স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে] (সা.আ.তি.না/কা.বে/পৃ. ৩৫)

এছাড়াও নাটকের চকিত কোনো সংলাপে নাট্যকার মিলিয়ে দেন জীবনদর্শনের গভীরতর কোনো সত্য —

ক. উপেং অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো, তা বর্তমান, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে

চলেছে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মতো ভূত আর ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে। বর্তমানকে সঁপে দেওয়া হয়েছে নিয়তির হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনড়, একটি মুহূর্ত শুধু। (সা. আ. তি. ন/কা. বে./পৃ.১৫)

খ. দাগী একশ' কিংবা দু'শো খুনের জন্য আমাকে তোমরা ফাঁসি দিতে পারো শুধু একবারই। এটা এক বাস্তব। সেটাই অলীক। (সা. আ. তি. ন/কা. বে./পৃ. ২৪)

গ. লোকটা বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনাবার জন্যে ওরা আমাকে ডেকেছিলো কোথাও। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য সাতটা কি আটটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিলো না। সেই জন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া। আমার সারা বাঁশী জুড়ে শুধু হাওয়ার হুটোপুটি। বাচ্চারা সবছুটে পালালো। হাওয়া ওদেরও সব আচ্ছন্ন করে দিলো। তারা ভীষণ মারলো আমায়। কিন্তু আমার দেহ হাওয়ায় ডুবে গ্যালো। তাজা তাজা মাংস সব রক্তে ভিজে গেল। আমার বাঁশীর শপথ, কিছুই বোধ করিনি আমি। হাওয়ায় হারিয়ে গিয়েছিলো আমার চেতনা। (সা. আ. তি. ন/কা. বে./পৃ. ৩৯)

নাটকের অন্তিমে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই সমুদ্রদ্বীপের জনপদ প্রকৃতি ও মানুষ। রয়ে যায়, স্মৃতি ও রেশ তাদের নিরর্থক কালক্ষেপণ, সঙ্গতিহীন কথোপকথন, ছেলেমানুষী কৌতুকক্রীড়া, ক্লান্তি, হতাশা এবং সর্বোপরি প্রলয় ও বিনাশকে অতিক্রমী জীবনবাদী অতীতচারণ ও মরণকে উপেক্ষার নৈরাশ্যভেদী নিরাসক্তি ও স্পৃহা –

লোকটা না আমাদের জন্য ব্যাপারটা বড় তাড়াতাড়িই এসে গ্যালো। তোমার সেই রূপকথা তুমি পারলে না বলতে, আমিও পারলাম না পুরো সুর ভাঁজতে। সবার জন্য আসবে,আগামীকাল, হয়তো বা আগামী পরশু, আমাদের মতো, চকিতে, অজান্তে, কোনদিন ... কোন একদিন, কোনখানে, কোন দ্বীপে, আর কোন শিষদার বংশীধারী ... অন্য কোনখানে ... সবখানে। অবধারিত সত্য এ। সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম। (সা. আ. তি. ন/কা. বে./পৃ. ৪০)

সাঈদ আহমদ এই নাটকে দেশজ প্রেক্ষিত, লোকজ অনুষঙ্গ ও পাশ্চাত্য রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন অবলীলায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই অভিনব প্রাকরণিক সংযোজনে তিনি ধার করেছেন পাশ্চাত্যের প্রকাশ রীতিগত কাঠামোটিকে কিন্তু এ নাটকের বিষয়ভাবনা অ্যাবসার্ড নয় বরং একান্তই তাঁর নিজস্ব অর্জন। "এবসার্ড থিয়েটার আমাদেরকে মুক্ত করতে চায় জীবনের বিভ্রম থেকে, কারণ সততার সাথে সত্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবার যোগ্যতার মধ্যেই মানুষ নামক বিবেকি প্রাণীর মর্যাদা নিহিত।"[২০] সমালোচকের এই মন্তব্যের সূত্র ধরেই আমরা দেখি এ নাটকের অন্তিমেও উচ্চারিত হয়না জীবনের নতুনতর কোনো অর্থময়তা কিংবা উঠে আসেনা কোনো দুর্ভর নৈরাশ্য, বরং বিনাশী পরিণামের সঙ্গে এক অদ্ভুত মীমাংসিত সত্তায় উত্তরিত হয় এইসব বিপর্যস্ত মানুষেরা। সর্বোপরি অন্তর্বৈশিষ্ট্যে ও রীতিগত আধুনিকতায় 'কালবেলা' আমাদের নাট্যজগতে নিয়ে এসেছে ভিন্নতর শৈল্পিক সমৃদ্ধি।

২. মাইলপোস্ট (১৯৭৬)

সাঈদ আহমদের দ্বিতীয় নাটক 'মাইলপোস্ট' (১৯৭৬)। অ্যাবসার্ড রীতির এই নাটকে রাজপথের ধারে দিকনির্দেশকারী জড়বস্তুটি বস্তুত প্রতীকী কেন্দ্রীয় চরিত্র। একটি অঙ্ক ও তিনটি দৃশ্যে বিন্যস্ত নাটকটির অন্যান্য আবর্তিত চরিত্রগুলো হচ্ছে– চৌকিদার, গোরখোদক, ডাকপিয়ন, সঙ, বড়ভাই, ছোটভাই এবং মা। বিচিত্র এই চরিত্র সমাবেশ থেকেই অনুমেয় যে নাটকটি স্বভাবে প্রতীকধর্মী। 'মাইলপোস্ট'–এর উৎস হল সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার উল্লেখ করেছেন ..."এই নাটকের পটভূমি দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদও এই সত্য প্রকাশের তাগিদে 'মাইলপোস্ট' লেখা হয়।"[২১]

নাটকের সূচনাতে মাইলপোস্টকে ঘিরে একটি অত্যন্ত অর্থবহ ইঙ্গিত রয়েছে। রাজপথের চৌকিদার প্রায়শই মাইলপোস্টের দিক নির্দেশকারী গন্তব্য ফলকগুলোকে

---

২০. আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২২, পৃ. ৫০

২১. সাঈদ আহমদ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৫, দ্রষ্টব্য– ভূমিকাংশ 'মাইলপোস্ট', পৃ. ৪৭

ইচ্ছেমত বদলে দেয়। এ যেন নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বস্তুত "এই মাইলপোস্ট হলো নিশ্চয়তার প্রতীক। দেশ, সমাজ ও সভ্যতাই আমাদের জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট করার জন্য বিভিন্ন সময়ে এইসব নিশ্চয়তা আমাদের জন্যে উদ্ভাবন করেছে। এইসব নিশ্চয়তা নিয়মের গণ্ডীভূত আর এক নিয়মেরই নামান্তর।"[২২] আবার একইভাবে ভিন্ন অর্থে শিল্পের জগতে নন্দনতাত্ত্বিক রীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সুস্পষ্ট নিশ্চিত নিয়মাবলি আছে। অ্যাবসার্ড নাম থেকেই বোঝা যায় যা স্বভাব বিরুদ্ধ, যুক্তি ও পারম্পর্য রহিত, বিরূপ বিসদৃশ ও বিপরীত তাই এ-নাটকের রীতিরূপে গৃহীত।[২৩] ফলে নাটকের প্রথমেই নাট্যকার চৌকিদারের ফলক বদলের মধ্য দিয়ে প্রথাসিদ্ধতার বিরুদ্ধে ও নিয়ম ভাঙ্গার প্রতি মানুষের অভীপ্সাকে তুলে ধরেন। এই রাজপথ, যেখানে বিচিত্রধর্মী মানুষের আনাগোনা তা আরেক অর্থে হয়ে দাঁড়ায় চলমান জীবনের গতিশীল পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট। "ব্যক্তিসর্বস্ব চেতনায়, ক্লান্ত বিরক্ত মানসিকতায় এই জীবন জোড়া আশাহীনতায় যে সত্য সেটাই বিশ্ব জোড়া Absurdity/"[২৪] আর এরই মাঝে চৌকিদার, গোরখোদক, ডাকপিয়ন, মা, বড় ছেলে, ছোট ছেলে – এরা এক একটি বিমূর্ত চরিত্র যারা দুর্ভিক্ষ ও মাইলপোস্টকে ঘিরে ক্রমাগত আবর্তিত হয় এবং এই দুর্বোধ্য দুর্ভর জীবনের যাওয়া আসার পথে মানবিক জীবন, মৃত্যু, ঠিকানা, দিক-নির্দেশনাকে তাদের সংলাপ ও ক্রিয়ার মধ্যে তুলে ধরে। অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের নিয়ম মেনে কখনো তা গভীর অর্থ সন্ধানী তীর্যক বিদ্রূপে বিদ্ধ সংলাপ, কখনো নেহায়েত বিষয় থেকে বিষয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। এ নাটকে জীবনবাস্তবতা ও চেতনাস্তরের জটিলতার – "কোথাও আপাত: সম্পূর্ণতা নেই – অজস্র খণ্ডে এক অবিশ্বাস্য অখণ্ড জীবনপ্রবাহের দিকেই ধেয়ে চলা।"[২৫] এই বাস্তবতা তাই গূঢ়তর বহুমাত্রিক গভীরতর বাস্তবতা।

মাইলপোস্ট-এর পরিস্থিতি পরম্পরা বিস্তারিত হয়েছে দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলাদেশের কোনো এক অঞ্চলের রাজপথে আসা যাওয়ার প্রক্রিয়ায়, মাইল

---

২২ আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৫, দ্রষ্টব্য– ' মাইলপোস্ট' নাটকের শিরোনামহীন ভূমিকা, পৃ. ৫০ ও ৫১

২৩. অজিত কুমার ঘোষ, *নাটকের কথা,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ২৮

২৪. সুনীল শর্মাচার্য, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ১৫, পৃ. ২০১

২৫. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৭, পৃ. ৫৫

ফলককে কেন্দ্র করে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন মানুষদের কথা ও কাজকে ঘিরে এবং ক্রমশ মানুষের স্রোত, তাদের আন্তঃক্রিয়া ও সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার এই বিপর্যয়ের বিপরীতে বিপর্যস্ত মানবিকতার দুঃখভোগের অবশ্যম্ভাবিতা, অলৌকিক সমাধানের জন্য প্রত্যাশা, অনিশ্চিত উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা এবং এই অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে গন্তব্যহীন মানুষের নিয়ম ভাঙার দার্শনিক সত্য রূপটিকে দেখিয়েছেন। সাঈদ আহমদের নাটকে যে বাংলা মায়ের রূপ ফুটে ওঠে সে উর্বর সমৃদ্ধা নারী নয় বরং বিধ্বস্ত, পরাভূত, শীর্ণ অবয়বের এক নারী যার অন্তরাআয় নিরন্ন সন্তানের জন্য অশ্রুময় দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়। বন্যা–দুর্ভিক্ষ–মহামারী ক্লিষ্ট সেই রিক্ত জননীর মূর্তি প্রথাসিদ্ধ দেশমাতৃকার আরোপিত মোহঘেরা রূপকে ছিন্ন করে পাঠক দর্শককে নিয়ে আসে পলিমাটির সংস্পর্শে।[২৬] এই বাংলা মায়ের সন্তানদের মাঝেও নাট্যকার তুলে ধরেছেন মাটি আঁকড়ে থাকা শক্তিময় রূপ।

এ নাটকের চরিত্র ও সংলাপ নির্মাণে নাট্যকার সাঈদ আহমদ বিশ্বস্ত থেকেছেন পুরোপুরি অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের প্রতি। ফলে তাঁর রচিত গোরখোদক, ডাকপিয়ন কিংবা চৌকিদার সাধারণ মানুষ নয় বরং আধুনিক পৃথিবীর জটিল অস্তিত্বসচেতন মানবমন ও তাদের নিজ নিজ প্রশ্নদীর্ণ আত্মিক সংকটের প্রতিভূ। এই প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসী বাস্তবধর্মী আদলের পরিবর্তে নাট্যকার প্রচ্ছন্ন করে তুলেছেন 'মাইলপোস্ট'–এর তীর্যক অ্যাবসার্ডধর্মী সংলাপে –

ক.	গোরখোদক	দুর্ভিক্ষ এসেছে আশীর্বাদের মত প্রচুর ফসল ওঠাতে হবে এখন ঘরে। আশে–পাশের গ্রামে আর বেশী গোরখোদক নেই। (সা.আ.তি.না/মা.পো/পৃ. ৫৯)
খ.	গোরখোদক	অসীম তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ, অন্তহীন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার... দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে মানুষ প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ওদের ছাড়বে না, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে তার গতি। গত রাত্রে কয়েক মাইল দূরে ছিল। আজ সকালে হয়তো পাশের দরোজায় ঘা মারছে। (সা.আ.তি.না/মা.পো/পৃ. ৫৯)
গ.	চৌকিদার	জীবনটা সর্বত্রই কঠিন – এখানে, ওখানে, অন্যখানে

২৬. আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২২, পৃ. ৫০

সবখানে। একে কঠিনতর করে লাভ কি? আমরা আর কিইবা করতে পারি? কল্পনাই আমাদের সম্বল, মানুষের জন্য এই যথেষ্ট। এটা নিতান্ত সত্য যে এ মুহূর্তে এ রাস্তায় দুজন বন্ধু ছাড়া আমার কেউ নেই। একজন মৃতের চিঠি বহন করছে। আর একজন মৃতকে শুইয়ে এসেছে মাটির নীচে। একজন ঠিকানা জানে, আর একজন জানেনা। দুজনেই অসহায়। (সা.আ.তি.না/মা.পো/পৃ.

ঘ. ডাকপিয়ন তাই বলে লক্ষ ক্ষুধার্তকে আপনি খাওয়াতে পারেন না। আর দুর্ভিক্ষ তো এদেশ ছেড়ে কোথাও নড়বে না। সে তার বিষদাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছে আমাদের শিরায়। বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে আমাদের রক্তে। শুধু দিন গোনা। (সা.আ.তি.না/মা.পো/পৃ. ৫৯)

ঙ. ডাকপিয়ন বিশ্বাস কর। চিঠির প্রাপকদের একজনকেও আমি জীবিত পাইনি, সব সুন্দর নামগুলো হাটের লিষ্টি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওরা সব বিদায় নিয়েছে; (সা.আ.তি.না/মা.পো/পৃ. ৬৪)

সমালোচক আতাউর রহমান এ নাটকের ভূমিকাংশে উল্লেখ করেছেন যে সাঈদ আহমদের নাটকের বিষয় ঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা দুর্ভিক্ষের মত পরিচিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তাঁর উপস্থাপন পদ্ধতি এবং চরিত্রসমূহের পরিচর্যা প্রথাসিদ্ধ প্রাচ্য বা বাংলাদেশের নাট্যধারার আওতায় পড়ে না বরং সংলাপের চমক, তীক্ষ্ন বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের গভীর ব্যঞ্জনা, চরিত্রগুলোর আন্তক্রিয়া অপরিহার্যভাবেই পাশ্চাত্যের ধারানুসারী।[২৭]

'মাইলপোস্ট' নাটকে বৃত্তাবদ্ধ অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে ক্লান্তি–নৈরাজ্য–অস্থিরতা–বিযুক্তি–সংশয়–নশ্বরতা–দুঃখবোধ বিমূর্ত হয়ে ওঠে, আবার হতাশার বন্ধনকে ছিন্ন করে জীবনের আশাবাদের অভিমুখে মানবিক প্রয়াসেরও উজ্জ্বল আভাস মেলে। কিন্তু এই পথ অনিবার্য বিভ্রান্তি ও দায়হীন বিচ্যুতির অভিযান। তাই মাইলপোস্টকে ঘিরে জড়ো হওয়া ভ্রাম্যমান মানুষেরা অলৌকিক স্বর্গীয় সমাধানে দুর্ভিক্ষের দাবানলকে

২৭. আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২২, পৃ. ৫০

নির্বাপিত করতে চায়। এখানে গোরখোদক কিংবা চৌকিদার, কিংবা ডাকপিয়ন, মা ও তার সন্তানেরা বাস্তবঘেঁষা চরিত্র থাকে না, বরং হয়ে ওঠে বহুমুখী জীবনদর্শনের দ্বন্দ্বময়তার চিন্তাস্রোত। অ্যাবসার্ড রীতির এই চরিত্রায়ণ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য —

"নাটকের চরিত্রগুলো তীক্ষ্ণ বৈরাগ্যধর্মী ও অসংলগ্ন সংলাপের মাধ্যমে কঠোর বাস্তবতাকে কঠোরতর নিষ্ঠার সাথে তুলে ধরে। চরিত্রগুলো ক্ষণে ক্ষণে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছিটকে পড়ে .. চূড়ান্ত সীমায় পোঁছার আগেই খান খান করে দেয় এতক্ষণের কষ্টলব্ধ প্রচেষ্টাকে। ... নাটকীয় চরিত্রগুলোর আশা–নিরাশার দ্বন্দ্ব ও মানসিক অসঙ্গতি আধুনিক মানসের অস্থিরতাই প্রকাশ।"[২৮] সংলাপের অভূতপূর্ব বিন্যাস ও অর্থময়তায় তা ধরা পড়ে—

ক. চৌকিদার	দুনিয়ার কথা ভাবছে কে? আমি হলাম গিয়ে বড় রাস্তার পাহারাদার।
গোরখোদক	বেশ তাহলে রাজপথের কথাই চিন্তা কর।
চৌকিদার	রাজপথের মঙ্গল কামনা করছি যেন ..
গোরখোদক	এর উন্নতি হয়। পরিবার–পরিজন আর বাগানবাড়ী নিয়ে মুখরিত হয়ে ওঠে যেন ...
চৌকিদার	বাজে কথা। এ হল এমন এক জায়গা যেখানে প্রত্যেক মানুষ বাধ্য হয়ে কিছু সময় কাটিয়ে যায়।
গোরখোদক	তাহলে এ ধরনের একটা রাজপথের প্রয়োজন কি?
চৌকিদার	প্রয়োজন? আসা–যাওয়ার মাঝখানে ক্ষণিকের বিশ্রাম, আর তোমার আমার মত দু'মিনিটের বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। (সা. আ. তি. না/মা. পো/পৃ. ৫৭)
খ. গোরখাদক	আমি এইটুকুই বুঝি আসাকে তুমি রুখতে পার কিন্তু যাওয়াকে নয়।
চৌকিদার	আসা এবং যাওয়া, কোনটাতে তুমি বেশি উৎসাহী?

২৮. আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২২, পৃ. ৫০

গোরখোদক আসা এবং যাওয়ার মাঝখানকার সময়টুকুতে। (সা. আ. তি. না/মা. পো./পৃ. ৫৬)

ইব্রাহিমের সন্তান উৎসর্গের ছায়ানুসারে মাইলপোস্ট–এর মা চরিত্রের স্বপ্ন সংকেতটির সাহায্যে নাট্যকার অন্তর্সত্তার গভীরে অবচেতন স্তরের চিন্তাস্রোত, বিশ্বাস ও সংস্কারকে উন্মোচিত করেছেন। এই স্বপ্নসংকেত পক্ষান্তরে পরিবর্তিত বাস্তব সংকটের বিপরীতে অনড় প্রাচীন প্রথাসিদ্ধ সমাধানের অসারতা ও যুগ অনুপযোগী সীমাবদ্ধতাকে সনাক্ত করে। সমালোচক সিকান্দার আবু জাফরের অভিমত— "মাইলপোস্টের স্বপ্নসংকেতটি যেন একথাই মূর্ত করে যে, ত্যাগ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা উন্মাদনার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি ত্যাগ বাস্তবে ঘটেনা।"[২৯]

নাটকের অন্তিমে সাময়িক ধর্মীয় উন্মাদনা প্রশমিত হয়ে এলে বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করে আগামী দিনের সোনালি সম্ভাবনার কথা উচ্চারিত হয়। নাটকের চৌকিদার, যে পূর্বাপর মাইলপোস্টের দিকফলক বদলে চলেছিল, সেই শেষ পর্যন্ত নিয়মের গণ্ডীভূত নিয়ন্ত্রণ ও জীবনের সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মাইলপোস্টটির ঘাড় ভেঙ্গে দেয় – প্রতীকী বঞ্জনায় যা নিশ্চয়তার আগল ভেঙে নতুন গন্তব্যের পথে অভিযাত্রার সূচক।

সমালোচকদের তুলনামূলক বিচার ও বিবেচনায়, 'মাইলপোস্ট' নাটকটির গাঁথুনির অপেক্ষাকৃত শিথিলতা, দর্শকের কৌতূহল উদ্রেককারী গতির অভাব ও ক্ষেত্র বিশেষে সংলাপ, চরিত্র ও দৃশ্য নির্মাণে নিছক পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সূত্র অনুসরণের বিবিধ সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে।[৩০] সেই সাথে নাটকের দ্বিতীয় ক্লাইমেক্স–উত্তর পরিপূরক তৃতীয় দৃশ্যের দীর্ঘসূত্রিতা নাটকের আরেকটি দুর্বল দিক।[৩১]

তারপরেও সামগ্রিক বিচারে অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে রচিত মাইলপোস্ট নাটকের কলা–প্রকৌশল, বক্তব্য ও রীতির অন্তঃস্থিত বোধ ও মানসিক সম্পদ আমাদের আলোড়িত করে। সেই সাথে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয় আরেকটি বতিক্রমী মেধাবী নাট্য সম্পদ।

---

২৯. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৭, পৃ. ৫৫

৩০. কবীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২, পৃ. ৮৮

৩১. হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৭, পৃ. ৫৫

৩. তৃষ্ণায় (১৯৭৬)

অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের ধারায় সাঈদ আহমদের তৃতীয় রচনা 'তৃষ্ণায়' (১৯৭৬) 'কালবেলা' নাটকের সমুদ্রবাসী উপজাতিদের আচার-প্রথা ও দর্শন, 'মাইলপোস্ট' নাটকের লোকায়ত জীবন প্রভৃতি অনুষঙ্গে লোকজ উপাদানের যে সুপ্ত ব্যবহার সাঈদ আহমদ করেছেন, 'তৃষ্ণায়' নাটকে সেই প্রবণতা হয়ে উঠেছে নাট্যকারের লোকজ ও দেশজ ঐতিহ্যের সচেতন ব্যবহার।[৩২] বিশেষত রূপকধর্মী 'তৃষ্ণায়', আধুনিক নাটকের আঙ্গিকে বহুল পরিচিত শিয়াল কুমির ছানার কথা-কাহিনীর আবরণে মানবচরিত্রের মৌলিক প্রবণতা ব্যাখ্যার স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত প্রয়োগ অনেক বেশী আবেদনময়, বিচিত্র ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।"[৩৩]

সমালোচকের ভাষায় - "তৃষ্ণায় নাটকে প্রচলিত লোককাহিনীতে সংরক্ত সমাকালের স্পর্শ মিলিয়ে নাট্যকার এনেছেন নতুন মাত্রা। 'তৃষ্ণায়', যথার্থ অর্থেই, বাংলাদেশের একটি পালাবদলকারী নাটক। শিয়াল এবং কুমিরের লোককাহিনীর আড়ালে আলোচ্য নাটকে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং একই সঙ্গে এই শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আত্যন্তিক আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার মাধ্যমে আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও শ্রেণীসংগ্রাম উপস্থাপন করে সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকে সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা।"[৩৪]

নাট্যকার তাঁর ভূমিকায় নাটকের দর্শন সম্পর্কে বলেন - "আমার ধারণা কোন রূপকথা বা লোককাহিনী সমকালীন সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে না যদি না সে গল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময়ে দেশ, সমাজ এমনকি আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও চিরন্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্প আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা।.... বৃহৎশক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে ধ্বংস করে, এইতো স্বাভাবিক এবং চিরন্তন সত্য। ডারউইনও তাই Survival of the fittest

৩২ হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৭, পৃ. ৫৫

৩৩ কবীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২, পৃ. ৮৮ ; হাসান হাফিজুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৭, পৃ. ৫৫

৩৪ বিশ্বজিৎ ঘোষ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৩, পৃ. ২৯০

এর থিয়োরী দিয়েছেন। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো সত্যি কি তাই?"[৩৫]

এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে নাট্যকার লোককাহিনীর সহজবোধ্য সরলরৈখিক চরিত্রগুলিকে রূপান্তরিত করেছেন অস্তিত্ব রক্ষার 'ইদুঁর দৌড়ে' সামিল বহুমাত্রিক জটিল সত্তায়। তীক্ষ্ণবোধ ও নির্বুদ্ধিতার মাপকাঠিতে অসম অবস্থান নির্ধারিত হয়েছে ধূর্ত শেয়াল ও সত্যান্ধ নির্বোধ কুমীর মায়ের এবং একটিমাত্র জীবিত সন্তান ফুকরোর। সাম্রাজ্যবাদ ও শোষকশ্রেণী যেভাবে চাতুর্য, লোক দেখানো ভাবের গাম্ভীর্যে, ক্ষমতার সুবিধা গ্রহণের নির্লজ্জ মাত্রাহীন লোভে ধোঁকা দিয়ে চলে অধীনস্ত ক্ষমতাহীন জনতাকে ঠিক সেই পন্থাতেই শিয়াল প্রতারক - বিদ্যাদানের নামে একে একে সাতটি শাবকের ছটিকে উদরস্থ করে। কিন্তু সপ্তম সাবকটি, আংশিক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আর অংশত ক্ষমতামুখ্য জীবনের, সহজাত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় শিক্ষাগুরু শেয়ালের পথ অনুসরণ করে, রূপান্তরিত সত্তায় পরিণত হয়। এমনকি রক্ষকই ভক্ষক জেনেও, সকল অপকর্মের সাক্ষী হয়েও সে তার ভায়েদের হত্যাকারী গুরুকেই রক্ষা করতে চায়। এ যেন কুমির শাবকের বেশে সেই ঔপনিবেশিক আমলের শাসনযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ দেশীয় দালালদের ভূমিকা, যাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে শোষক শাসনযন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার ওপর। ফুকরোর ক্রমঃ রূপান্তরে নাট্যকার দেখান সাম্রাজ্যবাদের দোসর বিভীষণেরা পরিবর্তিত চরিত্রে নিজেদেরকে দায়মুক্ত ভাবতে চায় স্বজাতি ও স্বদেশের সংগে যোগসূত্রকে অস্বীকার করে। কেননা সামাজিক অবস্থান, অর্থ ও ক্ষমতার মোহ তাকে যে স্বার্থকেন্দ্রিক আত্মতুষ্টি দেয় তা উৎস পরিচয়ের চাইতে অনেক বেশি লোভনীয়।

সাঈদ আহমদের আগের দুটি নাটক যেখানে মূলত অ্যাবসার্ডধর্মী, সেখানে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট 'তৃষ্ণায়' প্রধানত রূপকধর্মী এবং রীতির দিক থেকে 'অস্তিত্ববাদ' ও 'অধিবাস্তববাদে'র সমন্বয়। মানবচরিত্রের মৌল প্রবণতার কৃষ্ণ অধ্যায়গুলোর ব্যবচ্ছেদ করেছেন নাট্যকার মূলত শেয়াল ও কুমির শাবক ফুকরোর চরিত্রে। মানুষ প্রথমত অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা, তার সংরক্ষণ, পরে উত্তরণ ও সর্বোপরি শীর্ষারোহণের অভিলাষী। নাট্যকার মানবিক মনোজগতের এই ক্লিষ্ট লোভী রূপকে এদুটি চরিত্রের অ্যাসার্ডধর্মী সংলাপপ্রবাহে স্পষ্ট করে তেলেন -

---

৩৫ সাঈদ আহমদ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৫, দ্রষ্টব্য - শিরোনামহীন ভূমিকাংশ, 'তৃষ্ণায়', [illegible]

শেয়াল (বৃক্ষের প্রতি)... তা'হলে বল আমার কেন এত ক্ষুধা? কেন পারি না লোভ সংবরণ করতে? জবাব দাও, ঐ বাচ্চাদের মাংস এতো সুস্বাদু কেন? হয়তো বলবে আমার প্রবৃত্তি অতি নীচু। সত্যি বলছি প্রকৃতিকে জয় করা দুরূহ।..... কোন দিন কি পেরেছ এই প্রকৃতির মোহন ফাঁদ আর শঠতাকে বানচাল করতে? বাচ্চাদের দিকে তাকালে চোখে পানি আসে। গোটা শরীর হিম হয়ে যায়। তাদের দূরে ঠেলে দিই। আমার সোনামানিকের দল। হঠাৎ কখন দানবটা জেগে ওঠে। ক্ষুরের ধার আসে দাঁতে, দুরন্ত জঠর কাঁচা মাংসের নেশায় হয় উন্মত্ত। (ফুকরোর প্রবেশ) ওদের জীবন যে কত তুচ্ছ তা'ত জানিই। নির্বোধদের কোন অধিকার নেই জঙ্গলে ভিড় বাড়ানো। যত সব বোকারা কেন আমাকে ছেঁকে ধরেছে?

ফুকরো মৌন থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে মান্যবর ওস্তাদ যদি আদেশ করেন মুখ খুলতে পারি। পরিষ্কার বলবো যে ঐ বোবা, কালা, স্থবির বোধিবৃক্ষ থেকে কেউ কোন জবাব পায়নি।

শেয়াল তুমি কি আড়াল থেকে আমার কথা শুনেছিলে?

ফুকরো ওটা বর্বরদের কাজ। ভাবের যোগাযোগ আরও অনেক ভাবে হ'তে পারে। তোমার অস্তিত্বের মহৎ ছায়ায় আমি এতো সুন্দরভাবে গড়ে উঠছি যে দূরে থাকলেও তোমার গতির, চিন্তার, ভাবের স্পন্দন আমার দেহে লাগে।

শেয়াল বলত এই মুহূর্তে আমি কি ভাবছি?

ফুকরো ছাই ভস্ম।

শেয়াল বৎস কঠোর হয়ো না। আমি এক মারাত্মক আতঙ্কে ভুগছি। কোন সোজা পথ চোখে ঠেকছে না। সত্যের উৎস খুঁজছি। ভয় হয়, পান করলে নিদারুণ বিষবৎ লাগবে।

ফুকরো কেবল নিজেই নিজেকে সাহায্য করতে পার। যা করে

ফেলেছ তা কেউ বদলাতে পারে না। তোমার কর্মভাগ্য কারো সঙ্গে বিনিময় করা অসম্ভব।

শেয়াল — আমি যা করেছি তার এক রত্তিও কি তোমার জানা আছে?

ফুকরো — হ্যাঁ।

শেয়াল — কি করেছি, শয়তান এক্ষুণি বল্ কি করেছি আমি।

ফুকরো — বিস্ময়কর বা চমকপ্রদ কিছুই নয়। জঙ্গলের বোঝা একটু হালকা করে দিয়েছ। এমনি ওরা কারুর কোন কাজে লাগতো না। (সা.আ.তি.না/তৃ/পৃ. ১৩৩-১৩৪)

এ নাটকে ঘটনার বিস্তার হয়েছে মূল লোককাহিনীর আখ্যানকে অটুট রেখেই কিন্তু সাঈদ আহমদের আধুনিক নাট্য পরিচর্যায় আমরা পাই বহুমাত্রিক অর্থময়তা, আর সেই পরিচিতি উপাখ্যানও বদলে গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় গভীরতর জটিল জৈবনিক প্রতারণার বহুকৌণিক দৃশ্যপট। মানুষের বিরুদ্ধে পশুদের আত্মরক্ষার পথ নির্ধারণের এক জমায়েত সভা থেকে এ নাটকের শুরু। ধূর্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শেয়াল সেখানে বাক্‌সর্বস্ব নেতা যার মধ্য দিয়ে নাট্যকার বহির্সত্তা ও আন্তরজগতের প্রবঞ্চক দূরত্বকে স্পষ্ট করে তোলেন। শেয়াল ও ফুকরোর পারস্পরিক সংলাপে উঠে আসে এই স্বার্থান্ধ যুগের বিনিময় ভিত্তিক জীবনরীতির প্রকৃত স্বরূপ -

শেয়াল — প্রত্যেক কামড়ে উল্লসিত হয়েছি, শেষ রক্তবিন্দুর স্বাদটুকু উপভোগ করেছি। আল্লার দরবারে হাজার শুকরিয়া জানাই। তিনি আমারই জন্যে এ সুখাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে বিশ্বাস কর যদি ওরা বুদ্ধিমান হত তা হলে নিশ্চয়ই ভালবাসতাম। তুমিই ত এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

ফুকরো — আমার বুদ্ধি তোমার খেদমতে উজাড় করে দিতে চাই।

শেয়াল — ভাল কথা, তুমি কি আমাকে ঘৃণা কর?

ফুকরো — না।

শেয়াল — কেন?

ফুকরো — শুধু বুদ্ধিজীবীদের মহলেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠি।

শেয়াল — তোমার কি মনে হয় আমাকে?

ফুকরো — চলার দীর্ঘ পথ এখনও পড়ে আছে ওস্তাদ। সেই বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গির আনাচে-কানাচে তুমি এখনও পৌঁছাওনি যেখানে কর্মের সমাপনেই তার ইতি। কোন চুলচেরা বিচার, ক্ষেদ বা মোকাবেলা নিষিদ্ধ। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন চাড়া দিলে আর দশজনের মত মামুলি প্রাণী হয়ে যাবে।

শেয়াল — মানে অতীতের কোন বালাই নেই।

ফুকরো — অতীত কাপুরুষদের জন্যে।

শেয়াল — তাহলে আমার কি আছে? আমার ঝোলায় কি থাকবে।

ফুকরো — বর্তমান। বাকি সব ভোজবাজি আর মরীচিকা। (সা.আ.তি.না/তৃ/পৃ. ১৩৫)

প্রয়োজনের সম্পর্কে অনিবার্যভাবেই পারস্পরিক বৈরীতার অন্তর্স্রোত বয়ে যায়। নাট্যকারের রূপকধর্মী সংলাপ তাকে সাবলীলতায় প্রচ্ছন্ন করে তোলে। -

শেয়াল — অসম্ভব। আমার বুদ্ধি, বিচারশক্তি এখনো লোপ পায়নি। আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, বলবে?

ফুকরো — খুব নীচ প্রকৃতির লোক মনে করি।

শেয়াল — তোমার ভাইদের খেয়ে ফেলেছি এই জন্যে?

ফুকরো — না। তুমি শেষ টুকরো অবধি উপভোগ করেছ। সম্মান করতাম যদি কেবল পৃথিবীর বোঝা হালকা করতে। কিন্তু তুমি অমানুষিক আনন্দ পেয়েছ। সোজাসুজি বলি, নিতান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছ।...

শেয়াল — আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলে খুশী হবে?

ফুকরো — দোষী আখ্যা দিই না। তোমাকে ভালওবাসি না, ঘৃণাও করি না। সর্বান্তকরণে উদাসীন। আমার চৈতন্যে তোমার অস্তিত্বের কোন ঠাঁই নেই। (সা.আ.তি.না/তৃ/পৃ. ১৪৩-১৪৪)

সবলের কাছে দুর্বলের হার এবং অস্তিত্ব রক্ষা ও বিনাশে জীবনচক্রের বৃত্তবদ্ধতা ধরা পড়েছে গাধা চরিত্রের সংলাপে –

গাধা — এইত কেবল সেদিন, এক মাকড়সা এক পিঁপড়ে খেলো। সেই মাকড়সাকে বিড়াল খেলো, বিড়ালটাকে কুকুর খেলো, আর কুকুর গেলো হায়নার মুখে, সর্বশেষে হায়না সাবাড় হলো বিরাট এক বাঘের পেটে। তারপর বাপরে কি অস্বস্তি। অগত্যা বাঘ সাহেব কাকুতি–মিনতি করলেন ওষুধ বাতলে দিতে। নিষ্পাপ বোধি-বৃক্ষের একটি জ্যান্ত পাতা। বৎস, সব ঠিক হয়ে গেল। (সা.আ.তি.না/তৃ/পৃ. ১৩৭)

জীবনের অন্তহীন দৌড় প্রতিযোগিতায় ছুটন্ত মানুষ সফলতার বিনিময়ে অতীতকে বিকিয়ে দেয় নির্বিবাদে। অস্বীকৃত হয় তাবৎ সম্পর্কের বাঁধন। কেননা আধুনিক জটিল মানুষের পারমাণবিক অস্তিত্ব তাকে চাহিদাগতভাবে নিঃসঙ্গ ও নির্দয় অনুভূতিহীন করে তোলে। ছটি কুমির শাবকের মৃত্যুর পর রূপান্তরিত সপ্তম শাবক ফুকরো ও কুমির মা-র অদ্ভুত আলাপচারিতায় নাট্যকার জীবনের সেই করুণ অ্যাবসার্ডিটিকে তুলে ধরেন –

ফুকরো — তোমার কথাবার্তায় প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি উচ্চ শিক্ষার অলৌকিক মহিমা মোটেই বুঝতে পারনি।

মা — কেমন করে?

ফুকরো — তুমি উপলব্ধি করতে পারছ না যে আমরা যা ছিলাম তা আর নেই। আমাদের স্বভাব আর মনীষা দুই অসাধারণভাবে বদলে গেছে।.... এখন কোনো সেতুবন্ধ আর সম্ভব নয়.... আমাদের পৃথিবী অন্য.... শেয়াল আমাদের রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমরা এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে এসেছি। একবার পরীক্ষায় উতরেছ কি আর আগের মতো হওয়া অসম্ভব। (সা.আ.তি.না/তৃ/পৃ. ১৩৯, ১৪০, ১৪১)

আবার খুব অদ্ভুত ভাবেই নাটকের শেষাংশে নাট্যকার ফুকরোর মুখে কিছু সংলাপ তুলে দেন যার আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো ইতিবাচক ছদ্ম সম্ভাবনা –

মা	এত নিষ্ঠুরতা। আমার ছেলেরা একেবারে বদলে গেছে। ওরা আমার সন্তান নয়। কি পাপ করেছি, কেন এমন দিন দেখতে হলো?
ফুকরো	দুঃখ করো না মা আমার। হাসি মুখে সব কিছু মেনে নেও। তোমার ছেলেরা দানবের সঙ্গে লড়ছে, এক বিরাট রোদ-ঝলসানো মরুভূমি পার হয়েছে। এখন তারা হিমশৈলের মহাসাগরে স্নান করে পবিত্র হবে। ওদের একা ছেড়ে দাও। (সা.আ.তি.না/তৃ/পৃ. ১৪০)

আবার নাটকের শেষ পর্যায়ে সাঈদ আহমদ অস্তিত্ববাদ ও অ্যাবসার্ড রীতির সমন্বয়ে এক ধোঁয়াটে উপসংহার টানেন যেখানে শেয়াল কর্তৃক মা কুমিরকে দেখাতে হবে তার সাতটি ছানাকে। কিন্তু একটিকে সাত বার দেখানোর পরিকল্পনার বিপরীতে শেয়ালের চোখে ভেসে ওঠে ছটি মৃত সন্তানের ভাসমান, চলমান, বিবর্ণ অবয়ব নাকি নাট্যকার নির্মাণ করেন হত্যাকারীর অবচেতনের অপরাধবোধ ও মনোলোকের মৌলসত্য।

নাটকের অন্তিমে কুমির মা তার 'প্রজনন যন্ত্রাগারে সাত নয়, সত্তর নয়, কোটি কোটি সন্তানদের জন্ম দিয়ে' ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে। যেন শেয়ালের মোকাবেলা, ভিন্নার্থে উর্ধ্বমুখী লোভী এই সভ্যতার আগ্রাসী চাহিদাকে সম্পৃক্ত করে তা অতিক্রমের মত প্রবল শক্তি নিয়ে আবারও প্রত্যাবর্তন হবে তার। 'তৃষ্ণায়' মূলত অস্তিত্ববাদী রূপকধর্মী নাটক হওয়া সত্ত্বেও সংলাপ ও পরিস্থিতির বিন্যাসে, সেই সাথে 'আদিম জরায়ুতে যে অস্তিত্বের অনন্ত সংগ্রামের সূত্রপাত'[৩৬]- লোককাহিনির কাঠামোতে তার পুনরাবিষ্কার নাটকটিকে দিয়েছে অ্যাবসার্ড আবহ সম্বলিত এক ভিন্ন মাত্রিক ব্যঞ্জনা।

৪. প্রতিদিন একদিন (১৯৭৮)

আমাদের শেষ আলোচ্য নাটক সাঈদ আহমদের 'প্রতিদিন একদিন' সম্পূর্ণতই একটি মানসিক নাটক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও 'যুদ্ধ'

---

৩৬ সাঈদ আহমদ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৫, দ্রষ্টব্য - 'তৃষায়', পৃ. ১৪৫

এখানে সেই সময়কার সাধারণ নাট্য প্রবণতার পথ অনুসরণ করেনি। বরং এই নাটকে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবধর্মী রূপায়ণ প্রধান অবলম্বন বা focal Point না হয়ে হয়ে উঠেছে এক ভয়াবহ মানসিক যুদ্ধক্ষেত্রের Back drop, সেই সাথে যুদ্ধই এখানে এই বিমূর্ত চরিত্র যা সাঈদ আহমদের অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত যুদ্ধ একটি অশুভ শক্তি। রণক্ষেত্রের সহযোদ্ধাদের জীবনে, যুদ্ধোত্তর যে ভাঙ্গন, বিকার ও পারস্পরিক অবিশ্বাস তা থেকে ফুটে ওঠে যে এই অশুভ শক্তির বলয় থেকে কেউ মুক্তি পায় না, যেমন পায়নি স্বাধীনতার জন্য জীবন সমর্পণকারী সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ, আজমল, ফিরোজ, রফিক, মুনিরা।

যুদ্ধের সময়ে যাদের সম্মিলিত আত্মত্যাগ প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন বাজি রাখতে, যুদ্ধ উত্তরকালীন সময়ে তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের নেপথ্যে নিহিত অপশক্তি তথা নির্লজ্জ, কিম্ভূত অন্তর্সত্তাই বেরিয়ে এসেছে উলঙ্গভাবে। যুদ্ধের কয়েক বছর পর প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের এক পুনর্মিলনী সন্ধ্যায় এই নাটকের শুরু। আপাত স্বাভাবিক সংলাপ ও রীতিতে সূচিত হলেও ক্রমেই নাটকটি উন্মোচিত করেছে তার অন্তঃস্থ অ্যাবসার্ডিটির বিকৃত বিষম ধোঁয়াটে জগৎ। 'প্রতিদিন একদিন'-এর ভূমিকাংশে নাট্যকারের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য –

"পারিপার্শ্বের বিপুল প্রভাবশালী ঘটনা আমার নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে আমি বেছে নিই বটে, কিন্তু সবসময়ই আমার অন্বেষা ঘটনার সার, সত্যের শাঁস খুঁজে নেয়া। আমার এই মানস প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একটা সংঘাতের মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছিল, মানতেই হবে। দখলদার সেনাবাহিনীর নৃশংসতা, বলাৎকার, হত্যা, জনপদ নিশ্চিহ্ন করা এতই প্রকট বাস্তব, এ সবের প্রখর চিত্রাবলীর বিবরণ এড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপর নাটক দাঁড় করানো সহজ নয়। অথচ আমার লক্ষ্য কোনো বাস্তবতারই নিখুঁত কিংবা বশংবদ ধারাবিবরণী কখনোই নয়। বরাবরই আমি চাই ঘটনার কাঠামোটা ব্যবহার করে প্রতিটি সংঘটনেরই ভেতরের ভাষ্যটাকে স্বরূপে আনতে। ওতে যে মানুষ নরাচড়া করে, ঘটনার খাপে তাদের যে মৌলিক মানবিক সমস্যা নতুন নতুন চেহারা নেয়, তা খুঁজে বের করাই আমার নাটকের মৌল প্রবৃত্তি। আমার কুশীলব আবহমানের মানবসত্তার মূল গুণগুলোর অবক্ষয়, বিবর্তন, জাগরণ এবং পরিকর্ষণের জরীপের কাজ করে।"[৩৭]

---

৩৭ সাঈদ আহমদ, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৭, দ্রষ্টব্য – ভূমিকাংশ, পৃ. ১০

আলোচ্য প্রবন্ধের পর্যায়ে পৌঁছে নাট্যকারের আত্মমূল্যায়নের এই সারাৎসারটুকু সাঈদ আহমদের রচনা ধারায় আধুনিক নাট্যরীতির পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও বিবর্তনের গতিপথ সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

পূর্বতন তিনটি অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক থেকে 'প্রতিদিন একদিন'-এর কাহিনী বিন্যাস, সংলাপ ও চরিত্রগুলো উপস্থাপনরীতিতে ভিন্নধর্মী। অ্যাবসার্ড রীতির পরস্পর যোগসূত্রবিচ্ছিন্ন কাহিনীর পরিবর্তে আমরা এ নাটকে সুনির্দিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ, সংগতিপূর্ণ অথচ সংকেতময় অ্যাবসার্ডধর্মী সংলাপ দেখতে পাই। কিন্তু যে মুহূর্তে নাটকের চরিত্রগুলো যুদ্ধের একটি বিশেষ দিনের সংগ্রামের স্মৃতিকে স্মরণ করে, সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় বিচ্যুতি ও বিভেদ, সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয় মানবমনের গুহায়িত হিংস্র-বিনাশী-ঘাতকসত্তা –

মুনিরা — সেই ঐতিহাসিক রাতে আমি তোমার স্বার্থপরতার কুৎসিত চেহারা প্রথম বারের মতো দেখতে পেয়েছিলাম।

ফিরোজ — ঐ চাঁদ মুখকে কী যা তা বলছো। কে না জানে যে এরশাদ সেই টিপির উপর নির্মমভাবে একদল শুয়োরকে হত্যা করেছিল।

আজমল — সে যে চেঙ্গিস খাঁ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। [নিজের গ্লাস ভরে নেয়া]

রফিক — আমি এরশাদকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। ওর সাহসের গল্প অনেক লোককে শুনিয়েছি।

মুনিরা — ওকে যখন ডাক্তারদের তাঁবুতে আনা হলো তখন থেকে এক ঠায় ওর পাশে আমিই ছিলাম। সেবার ভার ছিল আমার ওপর। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হচ্ছিল। তাই ডাক্তার তাড়াতাড়ি পেথেডিন ইন্‌জেকশন দিল। কিছুক্ষণ পর গোঙ্গানী আর বিড়বিড় ; কী যন্ত্রণা, কী চিৎকার। "ওই হারামজাদারা আসছে। মারো, শুয়োরদের মারো। আমার পেছনে এসো। আমি মেরেছি, দ্যাখো, দ্যাখো, ঠিক জায়গায় মেরেছি, একটা বুলেট, কয়েকটি মাথা, সব ব্যাটা ঢুলে পড়ছে।" সারা শরীর আগুনের তাপে পুড়ছিল, ছটফট

> ছটফট, এপাশ ওপাশ করছিল। ওর মাথায় আইস ব্যাগ ধরে বসেছিলাম সারা রাত। চোখে-মুখে বীভৎস হাসি। আবার আর্তনাদ শুরু হলো, "আমি মেরেছি, ওদের বুকে মেরেছি, থেতলে দিয়েছি, কেমন নিশানা, দেখছো, তোমরা দেখলে? কিন্তু আমি যেন না মরি। আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখো। আমার যেন কিছু না হয়।" ওর দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। আশঙ্কাভরা আওয়াজে বলছিল, "বুলেট যেন আমার গায়ে না লাগে। শুয়োররা আমাদের দিকে মারছে। একটু ডাইনে, একটু বাঁয়ে, অল্প সামনে, ঐ তো ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ যে রফিক, ওকে লাগুক। ওর গায়ে বিধুক, আমি যেন এ যাত্রায় বেঁচে যাই। ফিরোজ, আজমল যাকে ইচ্ছা শেষ করো, যার গায়ে খুশি গুলি লাগুক। কী আসে যায় তাতে? আমাকে বাঁচতে দাও। আমি পৃথিবীকে ভালবাসি। আমাকে ফিরে যেতে দাও। আমার অনেক সাধ বাকি আছে। আমাকে আরও একটু সময় দাও।" [সবাই একেবারে স্তব্ধ] (প্র.এ/পৃ. ১৯)

জ্বর ও বিকারের মুহূর্তে উচ্চারিত এরশাদের এই প্রলাপ, মানুষগুলোর মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিকে বিধ্বংসী বিস্ফোরণে ধ্বসিয়ে দেয়। সহযোদ্ধাদের মৃত্যুর বিনিময়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার মরিয়া আকাঙ্ক্ষা, এক হঠাৎ ব্যবচ্ছেদে এরশাদকে ছিন্ন করে ; আমূল বদলে দেয় সঙ্গীদের সাথে তার যুক্ততার পরিচিত প্রেক্ষাপট। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। মানুষ প্রথমত নিজেকে ভালবাসে, নিজের স্বার্থ ও জীবনকে সকলের আগে অগ্রাধিকার দেয় – এই চিরন্তন মানবিক মৌল প্রবণতা বিকৃত রূপ নেয় যুদ্ধের বিক্ষুব্ধ প্রেক্ষিতে যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা একজন আরেকজনের জীবনরক্ষায় প্রতিশ্রুত। যেখানে অন্যদের মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও নিজের বেঁচে থাকার মানসিকতা ধ্বংস করে দিতে পারে আত্মত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণমন্ত্রকে।

সহযোদ্ধারা এরশাদের আত্মরক্ষার এই স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পাল্টে যায় একটি সাধারণ উষ্ণ মিলন সন্ধ্যা। মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে অন্তর্গত হত্যাকারীরা। মুনিরার উত্তেজক কথায় সবাই উদ্যত হয় এরশাদকে মেরে ফেলার জন্য –

মুনিরা কমরেডরা যদি সবাই রাজি হও তাহলে আজ রাতে আমরা সেই দিনের প্রতিশোধ নেব। এ-কাজটা অনেক আগে করা উচিত ছিল। আমরা ইতিহাসের দাবি মেটাব। আমরা এরশাদকে হত্যা করবো যেন ভবিষ্যতে আর কেউ বিপ্লবের অমঙ্গল আর আমাদের মৃত্যু কামনা না করতে পারে। বন্ধুরা মর্যাদা আর দেশের স্বার্থ ভুলে যেতে না পারে। ...

আজমল ... ... আমার হাতে আজ তোর মৃত্যু ঘটবে। বেল্ট দিয়ে হাতগুলো বেঁধে দাও।

ফিরোজ ওর চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধো, যেন এ-দৃশ্য উপভোগ করতে না পারে।

আজমল কিরে ব্যাটা, কেমন লাগছে? তোর স্নায়ুচাঞ্চল্য আমি বন্ধ করে দেব। ঘুনেধরা হৃদ-যন্ত্র আর পাকস্থলীকে কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুর, কাককে খাওয়াব।

রফিক কমরেডরা সবাই ওকে ঘিরে গোল করে দাঁড়াও। আমার কমাণ্ড পেলেই সবাই কষে লাথি মারবে ওর বুকে, মুখে, পেটে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে, আজমল আরম্ভ কর।

[রক্তিম আলো স্টেজে জ্বলবে। চিৎকার করে চারজন এরশাদের দিকে এগিয়ে আসবে। প্রায় ধরে ফেলে। কিন্তু এরশাদ ধীরে ধীরে ওদের হাত থেকে ফসকে সবার অলক্ষ্যে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাবে। ওরা কাল্পনিক ছোরা বের করে যেখানে এরশাদ পড়েছিল সেখানে ঘিরে বার বার আপন মনে আঘাত করবে – যেন এরশাদ ওখানে আছে। পরিবেশটা একটা Dream sequence-এর মতো হবে। Slow motion movement হলে ভালো হয়।]

(সম্বিৎ ফিরে পেয়ে)

আজমল এরশাদ কোথায়? কোথায় গেল?

মুনির এরশাদ তো নেই। কী হলো?

রফিক তবুও আমরা তাকে খুন করেছি। (চেঁচিয়ে) এরশাদ স্বপ্ন

স্ব-প্ন দেখো-সুন্-দর-স্বপ্ন। [যে যার যায়গায় Freeze হয়ে যাবে। মিউজিক, আস্তে আস্তে আলো নিভবে।]

এখানেই কিন্তু শেষ হয় না নাটকের ক্রম প্রসারিত অ্যাবসার্ড জগতের। একে একে বেরিয়ে আসে পরিবর্তিত সময় ও প্রেক্ষাপটে প্রতিটি মানুষের ভিন্নতর রূপ। সমালোচকের মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য - "সাধারণত বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতির বেলায় দেশমাত্রই ভয়ানকভাবে সংকটাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, উচ্চাশার বিস্ফোরণ, শৃঙ্খলার সংকট, অন্তর্বিরোধ এবং পারস্পরিক সংঘাত ও অবিশ্বাস সমসাময়িক পরিস্থিতি নিদারুণভাবে জটিল করে তোলে।"[৩৮]

সেই সময়কার সমাজপ্রেক্ষিতে নাট্যকারের আলোকপাত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক- "১৯৭৩-৭৪ সালের দিকে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। ... মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ কেউ হতাশ আবার কেউ অর্থৈবিত্ত স্বপ্নিল জীবনযাপন প্রয়াসী ... সত্যিকথা বলতে কি '৭১-এর তরতাজা গনগন ত্যাগী নিঃস্বার্থ মুক্তিযোদ্ধাকে '৭৩-'৭৪ সালের দিকে প্রায় চিনতেই পারছিলাম না।"[৩৯] আর নাট্যকার সেই অসুস্থ বিকারগ্রস্ত সময়কে নাটকের অ্যাবসার্ড আবহে নাটকের প্রতিটি বাঁকাচোরা বিকৃত চরিত্রে বিমূর্ত করেছেন। যুদ্ধ শেষে এরশাদের অবচেতনের বিশ্বাসহন্তায়ক সত্তা বিবমিষাময় আত্মগ্লানিতে তাকে পরাভূত করেছে, আজমল কালো টাকার পাহাড় গড়তে বেছে নিয়েছে নকল ওষুধের ব্যবসা, ফিরোজ দারিদ্র্যের কষাঘাতে অনাহারে মৃতপ্রায় ভিখারিনীকে উপেক্ষা করে অন্নগ্রহণ করতে পেরেছে নির্বিকারে, মুনিরা এবং রফিক সহযোদ্ধা এরশাদকে খুন করতে উদ্যত হয়েছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী দুই পরিস্থিতিতে একই মানুষের বৈপরীত্য, ভ্রষ্ট সময়ের নষ্ট পৃথিবীতে আলবেয়ার ক্যামু কথিত - " মানুষের সঙ্গে জীবনের, তার জীবনের সঙ্গে পটভূমির বিচ্ছিন্নতা তথা অ্যাবসার্ডিটিকেই"[৪০] চরম বাস্তব প্রতিপন্ন করে। হতাশাগ্রস্ত মানবীয় প্রান্তিক পরিস্থিতির অন্তর্বাস্তবতা, নাট্যকার অধিবাস্তব পরিচর্যারীতির সফল প্রয়োগে তুলে ধরেন কতিপয় বিস্ফোরন্মুখ দৃশ্যে -

---

৩৮ মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, *পূর্বোক্ত,* টীকা নং ৭, দ্রষ্টব্য - প্রথম পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে, পৃ. ৭

৩৯ সাঈদ আহমদ, *পূর্বোক্ত,* টীকা নং ৭, দ্রষ্টব্য - প্রথম পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা, পৃ. ৯

৪০ আলী আনোয়ার, *আধুনিক ইউরোপীয় নাটক,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯, পৃ. ৮৭

ফিরোজ — এতজোরে কেন বাজাচ্ছ, আমার মগজ ছিটকে বেরিয়ে পড়বে।

রফিক — চু–প কর। শান্তি চাই।

মুনিরা — খাবারের কী খবর?

ফিরোজ — এত আলো কেন?

আজমল — রাত একটা বেজেছে, কথা বলছো না কেন তোমরা?

রফিক — বেশ। আজমল, মুনিরা, জিজ্ঞেস কর, ও কেমন আছে? ফিরোজ তুমি কেমন আছ?

সবাই — (তালে তালে) ফিরোজ – তুমি–কেমন আছ? ফিরোজ–বাছা কেমন আছ? ফিরোজ বাবা কেমন আছ? (চার ধারে গোল করে ঘুরে ঘুরে বলছে। বেষ্টনী ছিঁড়ে ফিরোজ বেরিয়ে আসে। ক্যাসেটটা বন্ধ করে, পায়ের জুতো খুলে টেবিলের উপর জোরে কয়েকবার মারে।)

ফিরোজ — আমি ক্লান্ত, আমি তোমাদের ঘৃণা করি। কোন নিঃসঙ্গতা থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিলাম তোমাদের এই পার্টিতে, আজ রাতে, উপভোগ করতে, সব কিছু ভুলে যেতে, তার এক রত্তি খবরও তোমরা জান না। এই বাড়ি থেকে এক্ষুণি বেরিয়ে যাবো জনকোলাহলহীন, ভয়াবহ নিরেট অন্ধকারে। তোমরা কী লজ্জিত? আমার মতো? ভয় হয় বাইরে গেলে হয়ত বিস্ফোরণ ঘটবে আমার অস্তিত্বের। (চিৎকার করে) শুয়ারের দল, শান্তি দাও।

(কোনো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে যায়)। (প্র.এ/পৃ. ৩৫)

'প্রতিদিন একদিন' নাটকের শেষে এসে নাট্যকার ভেজাল ওষুধ ব্যবসায়ী আজমলের সংলাপে, আত্মবোধনধর্মী একটি মানবীয় রূপান্তরের ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন। ক্লিষ্ট যুগের ফসল যে উন্মুলিত মানুষ কিংবা 'অমানুষতা–নিঃসরক মানুষ',

বাস্তবতা ও নির্বস্তুকতার স্বপ্ন জগতের মিলন প্রক্রিয়ায়[৪১] কিভাবে মনুষ্যত্বে প্রত্যাবর্তন করে, তারই আশাবাদ ও আভাস মেলে সাঈদ আহমদ রচিত বিমূঢ় রীতির সংকেতধর্মী সংলাপে —

আজমল হঠাৎ দেখি আমি আমাদের গাঁয়ের গোরস্থানের ভেতর দিয়ে অসীমের দিকে হন হন করে ছুটে চলেছি। আমার হাওয়া লাগতেই কবরগুলো একে একে ফেটে চৌচির হতে লাগল। আস্তে আস্তে লাশগুলো ওঠে দাঁড়ালো। একজন যুবক ইশারায় ডাকছিল। এগিয়ে গেলাম, কঙ্কালটা আমার দিকে মুখ করে বললো, আমার মা বাবাকে দেখতে পাচ্ছ? পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন ওরা। কঙ্কাল ভেদ করে নজর ফেললাম, আরে এ কী? ওরাতো আমার মা, বাবা– ছেলেটিকে ভালো করে দেখলাম। আশ্চর্য, ওটা সে নয়, ওটা তো আমি। সারা দেহে কাঁপনের ঢেউ বয়ে গেল। ছেলেটা ক্ষীণ আওয়াজে বললো, অনেকদিন আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি, সেই মুসার সময়েরও আগে থেকে। আমি ইউসুফ, সুন্দরের পূজারী শাহ্‌জাদা, তুমি কী স্বপ্নের অর্থ জানতে এখানে এসেছো? সাতটা আধমরা গাভী সাতটা মোটা গাভীকে কেন খাচ্ছে? বারে বারে খাচ্ছে, সাত সাত বার খাচ্ছে— তবে জেনে রাখো যুগ বদলে গেছে, দৃশ্যপটে রূপান্তর ঘটেছে, এখন কিছু ঘটলে খুব ভয়াবহ অমানুষিক রূপ ধারণ করবে। সাতটা নয়, সাত কোটি সন্তানের জীবন আবর্তে জড়িয়ে পড়বে। শান্তিতে, আনন্দে বাঁচতে দাও, বিরাট সংকট পেরিয়ে এসেছে ওরা। ভেবে দেখো, এক্ষুণি পথ বেছে নাও। আর বেশি সময় নেই। আমি জান কী করেছি? আমি কথা দিয়েছি, ওরা, ওরা বাঁচবে। কোটি কোটি নিষ্পাপ সন্তান হাসবে, গাইবে। (প্র.এ/পৃ. ৩৭–৩৮)

---

৪১ কবীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ২, পৃ. ৮৮

বাংলা অ্যাবসার্ড নাট্যধারার পুরোধা পুরুষ কৃতী নাট্যকার সাঈদ আহমদের 'নাট্য চতুষ্টয়ে'র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা একাধারে পাশ্চাত্যের এই বিশেষ নিরীক্ষাধর্মী নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্য ও অন্যদিকে নাটক অন্তঃস্থিত উপাদানে লেখকের নিজস্ব সংযোজনের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব অনুধাবনে সচেষ্ট হয়েছি। তাঁর নাটক কেবল মানুষের নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যকে প্রতিফলিত করেনি বরং শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব, সামাজিক-মানসিক বিপর্যয়ের স্বরূপ, কিংবা মানব-অস্তিত্বের বিপুল সংকটের সত্যিকার অবয়বকে ধারণ করে, মিথ্যা রূপের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সামঞ্জস্যহীনতা ও হতাশার অবসান ঘটাতে চেয়েছে।[৪২] অনায়াসে বাস্তবকে মেনে নেবার নির্ভীক প্রবণতাই অ্যাবসার্ড নাটকের মূল অভীষ্ট। আলোচ্য নাট্য চতুষ্টয়ের মূল্যায়ন সেই সত্যকেই সমর্থন করে।

---

৪২ আতাউর রহমান, *পূর্বোক্ত*, টীকা নং ৫, পৃ. ১০০